নিবেদিতা বিশ্বাস*

নারীশিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

সারসংক্ষেপ: *রবীন্দ্র-সৃষ্টি সাহিত্যে মূলত জীবনের জলছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সেই অংশের বৃহদাকার জায়গা জুড়ে নারী জীবন ও নারীশিক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে মনে প্রাণে মুক্ত ও আধুনিক চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। নারীশিক্ষা তথা নারী স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। নারীর মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যেমন তিনি বিশুদ্ধ শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তেমন মেয়েদের নারী হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার কথাও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মেয়েরা শুধু আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, আন্তরিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার জন্য সবসময় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এমনও নয়। 'নারীশিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর মনোজাগতিক নানা প্রেক্ষাপটের দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।*

> 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন কর, প্রাণকে পোষণ করে। ...প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী'[১]

সৃষ্টিতে নারীকে যতই 'পুরাতনী' বলা হোক, বা বলা হোক 'আদ্যাশক্তি', নারীর স্বাধীনতা এবং শিক্ষা সম্পর্কে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, মূল সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বা সভ্যতার মূল স্রোত থেকে নারীকে জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। অন্তত ইতিহাস আমাদের সেভাবেই ভাবতে শেখায়।

'নারী পুরাতনী' একথা বলার মধ্যে যেমন নারীর গৌরব নিহিত রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তার সামাজিক অবস্থানকে সংকুচিতও করে দেখা হয়েছে। নারীকে আদ্যশক্তি বলা হলেও সব সময়ে তা মানা হয় নি। পুরুষতন্ত্র নিজে বুঝেছে এবং জগৎ-সংসারকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সন্তান জন্মদান এবং তার প্রতিপালনের মধ্যেই নারীর প্রকৃত সার্থকতা। সমাজ ও জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নারীর বিশেষ ভূমিকা নেই বা তার প্রয়োজনও নেই। এখানে নারীর উর্বরতা শক্তিকেই স্বীকার করা হয়েছে, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি বা অন্যান্য সম্ভাবনাকে সেই অর্থে গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালার মতো বিদুষী নারীরা নারীকুল তথা মানবসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

*পিএইচ.ডি. গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্যি যে প্রেমে-মমতায়, স্নেহে-ভালোবাসায়, ধৈর্যে-সহনশীলতায় নারী মানবসংসারকে বেঁধে রেখেছে চিরকাল। নারীহৃদয়ের রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়েছে পৃথিবী। চর্যাপদের 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'-র মতো নারীর এই সকল স্বভাবগুণের জন্যই সে পুরুষের হাতে বন্দী হয়েছে, সংসারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে চিরকাল। 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের কথা সরস ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন–

> 'মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরনো অন্ধকারে, গাড়ি চলতে ছিল ভারি লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে বলত মেমসাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান'।[২]

নারীর এই পর্দানসীন জীবনের যেমন অজস্র ও নিখুঁত ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি নারীকে এই অচলাবস্থা থেকে তিনি দেখতেও চেয়েছেন। নারী-শিক্ষার বহু প্রতিকূলতার কথা জেনেও লীলা মিত্রের নারী-শিক্ষাভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করে 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন–

> 'যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে–শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।'[৩]

অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার কথা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছেন–

> 'শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষ কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই, মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী?'[৪]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা খানিকটা হলেও রক্ষণশীল। এক্ষেত্রে হয়তো তাঁর চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু নারীদের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শুধু পুথিগত শিক্ষাকে যথেষ্ট বলে মানেন নি তিনি। এক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষাদানের কথাও বলেছেন। যা একজন মেয়েকে পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। পাশাপাশি একথাও বলেছেন, শিক্ষা মনুষ্যত্ব লাভের উপায় এবং তার অর্জন প্রত্যেক মানুষের সহজাত অধিকার। তাই নারীরও সে অধিকার সহজাত একথা বলাই বাহুল্য আর মেয়েদের স্বভাবে আত্মসমর্পণের যে আদর্শই থাকুক না কেন, তা দাসত্ব নয়। 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়।'[৫]

শিক্ষা নারীর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে–এমন রক্ষণশীল ভাবনা পোষণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। তাই 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন–

> 'আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।'[৬]

রক্ষণশীল সমাজের জাঁতাকলে পড়ে মেয়েরা দীর্ঘকাল বন্দী জীবন কাটিয়েছে। দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং 'বিশুদ্ধ শিক্ষা'-র অভাব তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা দিয়েছে পদে পদে।

স্ত্রী ও মা হওয়াই নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশেই তার প্রকৃত পরিচয়। আর তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, নারী তা একসময় নিজেই উপলব্ধি করেছে।

> 'আমাদের দেশে...কৃত্রিম বন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।'[৭]

আসলে শিক্ষা, যাতে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তা শুধু বই পড়ে হতে পারে না। কাজের মধ্যে দিয়েও মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। বহিঃপ্রকৃতিতে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে, সংগ্রাম করতে করতে মানুষ শেখে। জীবনে চলার পথে এইরকম আঘাতে আঘাতে মানুষ পরিণত, পরিপূর্ণ ও শিক্ষিত হয়। আর মেয়েদের প্রকৃতিই এমন যে বহিঃপ্রকৃতির চেয়ে অন্তঃপুরের কাজই তাদের বেশি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র'-এ বলেছেন–

> 'মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেকদিন ও অনেকক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।'[৮]

–এখানে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণটিকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা বা তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের কোনো ছাপ ফুটে ওঠে নি। বরং তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ নারীকে একদিকে প্রকৃতি যেমন বন্দী করেছে, অন্যদিকে পুরুষ তাকে বন্দী করেছে। 'প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিত পটুত্ব';[৯] তেমনি 'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে।'[১০] কিন্তু যুগ বিবর্তনের ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। একটা সময় মেয়েরা সংসারের গণ্ডি অতিক্রম করতে শিখেছে। দীর্ঘকাল এই বন্দীজীবন কাটাবার পর এসেছে সীমানা ভাঙার যুগ। রবীন্দ্রনাথের মতে–'...সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায়নি, দ্রুত পদেই গেছে।'[১১] নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনারও বিবর্তন ঘটেছে দ্রুতগতিতে। তাঁর কোনো রচনায়, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্বময় মনোভঙ্গি এলেও তা চূড়ান্ত নয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা খানিকটা সত্য মনে হলেও রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা সম্পর্কে মনে প্রাণে মুক্ত ও আধুনিক চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। তাই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষাভাবনায় এই পরিবর্তন তাঁরই পরিবারে কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং তৎকালীন সমাজে তা কী প্রভাব ফেলেছিল, তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা করেছেন–

> 'বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সব-প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তা মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বার-খোলা পাল্কিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি।'[১২]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন বা সম্ভ্রান্তবংশের নীতি-আদর্শকে, একপ্রকার লঙ্ঘন করে এভাবে নারীশিক্ষা তথা নারী স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু এ পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। মেয়েদের আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য একটা সময়, বিদ্যাচর্চা ও বুদ্ধির চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আবশ্যক হয়ে উঠেছে নারীশিক্ষা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> 'নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্র মেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারে যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়।'[১৩]

মেয়েরা যত শিক্ষিত হয়েছে, তাদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হাজারো কুসংস্কারকে যুক্তি দিতে বিচার করতে শিখেছে, ততই তারা 'ঘরের সমাজ' ছেড়ে 'বিশ্বসমাজে' উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মানবসভ্যতার ব্যবস্থা-শাসনভার ছিল পুরুষের হাতে। তাই সে তার মতো করে গড়েছিল সমাজকে। নারীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীরও স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গা তৈরি হয়েছে। বহুদিনের যে সংস্কারের জালে নারীর হৃদয় আবদ্ধ ছিল তা থেকে হয়ত পুরোপুরি মুক্তি পায় নি, তার মধ্যে প্রথমে খানিকটা ছেদ পড়েছে এবং কালে কালে একটু একটু করে এই বন্ধনজাল ছিন্ন হয়েছে।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কতটা আধুনিক মনস্ক ছিলেন তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-এ। 'চিঠিপত্র'-এর ত্রয়োদশ খণ্ডে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একাধিক পত্রে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পড়াশোনা সম্পর্কে যেমন উদ্বিগ্ন ও সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কনিষ্ঠা কন্যা মীরার লেখাপড়া সম্পর্কে সেই উদ্বেগ বা সচেতনতায় কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। তাই চিঠিতে কখনো লেখেন–'শমী মীরার পড়া কেমন চল্‌চে?[১৪] আবার কখনো–'আমি মীরাকে এক ঘণ্টা ইংরেজি পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি।'[১৫] একজন যথার্থ পিতা হিসেবে পুত্র-কন্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাবনার বৈষম্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের মনে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, নারীর মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যেমন তিনি বিশুদ্ধ শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তেমন মেয়েদের নারী হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার কথাও বলেছিলেন। অভিভাবক বা পিতা রবীন্দ্রনাথ কন্যা মীরার ক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক শিক্ষার কথা কিন্তু বিস্মৃত হন নি। তাই সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে মীরার পড়াশোনার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাকে ঘরকন্নার কাজ শেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন–

> 'বৌঠাকরুণকে বলে দিয়ো মীরাকে তিনি যেন তার ঘনকরনার সঙ্গিনী করে রাখেন–চাই কি ওকে দিয়ে তিনি তাঁর হিসেব রাখাতে পারেন। এ ছাড়া মিষ্টান্ন তৈরির ব্যাপারে যদি তাকে সহকারীরূপে দীক্ষিত করে রাখেন তবে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কাজে লাগ্‌বে এবং তোমাদেরও মধ্যে মধ্যে গুরুদক্ষিণা মিলতে পারে।'[১৬]

–কারণ রবীন্দ্রনাথ একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজের নানা বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবার ফলে একটা সময় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদেরও অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাই অন্তঃপুর এবং বহির্বিশ্ব কোনো একটিকে বাদ দিয়ে নারী সম্পূর্ণা হয়ে উঠতে পারে না। তাকে উভয়ক্ষেত্রেই হয়ে উঠতে হবে সমান পারদর্শী। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধীদের সমালোচনা করেই বলেছেন-

> 'স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের সার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজকর্মের অনুরোধে তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী স্বাধীনতা-বিরোধীদের এই এক অতি পুরোনো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারও চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ করে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত-অস্বাভাবিক।'[১৭]

একমাত্র নারীর শিক্ষার দ্বারাই অন্তঃপুরের এই পর্দার আড়াল সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

আসলে বন্ধনমুক্তির এই আকুতি নারীর নিজের মধ্যে জাগ্রত হওয়াটা খুব জরুরি। এ প্রসঙ্গে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে শ্রীমতী লীলা মিত্রের চিঠির একটি কথা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক : 'অতএব, গরজ যাহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।'[১৮] রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভাবনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতহীন সমর্থন ও তাঁর শিক্ষা ভাবনারই পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাই বারবার শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। 'গোরা'-র সুচরিতা, ললিতা, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্য, 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিণী–এরা প্রত্যেকেই শিক্ষায়, রুচিতে, ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, আধুনিক। তাঁর 'চিরকুমার সভা' (১৩০৭) নাটকের নৃপবালা, নীরবালা, শৈলবালা, নির্মলা–এরা সকলেই রুচিশীলা, সুশিক্ষিতা। পুরবালা ও তার মা জগত্তারিণী এদের তুলনায় একটু সেকেলে হলেও শিক্ষার বিরোধী নয়। তাই পুরবালা তার স্বামী অক্ষয়কে বলেছে– '...মা...তোমারই কথা শুনে...বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।'[১৯]

এছাড়া এই নাটকের শৈলবালা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। যে তার অকালবৈধব্যকে যুক্তির সঙ্গে মেনে নিয়েছে। হাহাকার করে নি বা সমাজের কাছে মাথা নত করে নি। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহস-বুদ্ধিমত্তায়, রুচিশীলতা এবং ব্যক্তিত্ববোধে সে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। আসলে বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার গরজ বা আকুতি নারীর নিজের মধ্যে জেগে ওঠা ভীষণ প্রয়োজন। তা না হলে পুরুষের তাগিদ বা শক্তি কখনোই তাদের সেই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারবে না।

সবশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মেয়েরা শুধু আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, আন্তরিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তার জন্য সবসময় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এমনও নয়। রবীন্দ্রনাথের এই আন্তরিক শিক্ষার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। এখানে মৃণালের গৃহত্যাগের মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তাকে বলা যেতে পারে অন্তর্শিক্ষারই ফল। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গেছে।

আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' । অর্থাৎ শিক্ষা তাই যা মানুষকে মুক্তি দেয় । মৃণালের আত্মোপলব্ধি তাকে মুক্তির ঠিকানা দিয়েছিল বলেই সে আর সংসারের পাঁকচক্রে ফিরে আসে নি । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা ভাবনা শেষ পর্যন্ত নারীকে মানবত্বে উত্তীর্ণ হওয়ারই প্রেরণা দেয় ।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৬ (প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৪৪) পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ত্রয়োদশ খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৪১৭, পৃষ্ঠা : ৭১১

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭ (প্রকাশ : ১৩১৫), পৃষ্ঠা : ১৩৮

৪. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪০

৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'সমাজ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ত্রয়োদশ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ২৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র', 'পরিশিষ্ট', 'সমাজ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭, পৃষ্ঠা : ৬৭৯

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৬ (প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৪৪) পৃষ্ঠা : ৩৬৩

১০. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৩-৩৬৪

১১. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৫

১২. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৫

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৬৬

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা : ১৩৯

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪২

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৯

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'বিশ্বযাত্রী', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (দশম খণ্ড), পৃষ্ঠা : ২৯০

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪১৭ (প্রকাশ : ১৩১৫) পৃষ্ঠা : ১৩৭

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিরকুমার সভা', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৬৯৬